বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
রাজনৈতিক চিন্তাধারা

প্রফেসর ড. রওনক জাহান

সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
ঢাকা, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
রাজনৈতিক চিন্তাধারা

প্রফেসর ড. রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), বাংলাদেশ
ও
ভিজিটিং স্কলার, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রবন্ধটি ১৭ই এপ্রিল ২০১৯ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : ইতিহাস রচয়িতা

আমাদের প্রজন্ম, যারা বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হতে দেখেছে এবং তার পেছনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে অসামান্য অবদান তা প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল্যায়ন সহজ ভাষায় ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। আমি নিজে যখনই বঙ্গবন্ধুর কথা ভাবি তখনই আমার প্রথমে মনে পড়ে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের সেই উত্তাল দিনগুলির কথা। আমি তখন ঢাকাতেই ছিলাম। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা শেষ করে ১৯৭০-এর ডিসেম্বর মাসে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেছি। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসেই সেই ঐতিহাসিক নির্বাচন হয় যাতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করে। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯-র মধ্যে ১৬৭ আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি জয়লাভ করে। ছয় দফা এবং এগারো দফার ভিত্তিতে নির্বাচনী ইশতেহার রচিত হয় এবং নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হয়। সমগ্র জাতিকে অভূতপূর্বভাবে ঐক্যবদ্ধ করা হয় বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের এই বিশাল সাফল্যের পর থেকেই আমরা বিপুল আশা উদ্দীপনার মধ্যে ছিলাম। বাংলাদেশ যে সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তা নিয়ে আমাদের মনে আর কোনো সন্দেহ ছিল না। তখন একমাত্র প্রশ্ন ছিল আমরা কি শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে এই স্বাধীন দেশ সৃষ্টি করতে পারব? নাকি আমাদের একটা বিরাট রক্তাক্ত সংঘাতের পথে যেতে হবে?

আমার মনে পড়ে ১লা মার্চে যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত করলেন, এবং তার পরে যখন বঙ্গবন্ধু ৩রা মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষই তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যবর্গ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সবাই পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল। পৃথিবীর আর কোনো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট দেশটির জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত প্রশাসনকে এভাবে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করতে দেখা যায়নি। এর একটি প্রধান কারণ হল বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলন এমনই ব্যাপক ও সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাপার হয়ে পড়েছিল যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সচল রাখার প্রয়োজনে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই বঙ্গবন্ধুকে সারা দেশের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়।

মার্চ মাসের ২ তারিখের পর থেকেই প্রতিদিন আমি ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। দেখতাম

রাস্তায় হাজার হাজার লোক, কিন্তু সবাই ছিল শান্তিপূর্ণ।সবারই মনে এবং মুখে একই কথা যা ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দেওয়া বক্তৃতায় বললেন। তিনি বললেন:"*এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*"। আমি নিজে সেদিন রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত

ছিলাম, দেখেছিলাম লাখো মানুষের ঢল, সবার মনে একই আশা এবং উদ্দীপনা।

আমার মনে আছে আমি তখন একটি কথা খুবই ভাবতাম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে ফরাসী দার্শনিকরুশোর 'সামাজিক চুক্তি' (social contract) বইটি খুব প্রিয় ছিল, বিশেষ করে রুশোর একটি তাত্ত্বিক ধারণা "*general will*"। যখন পড়তাম এবং পরবর্তীকালে ক্লাশে আমি এটা পড়াতাম, তখন ভাবতাম general will কেমন হতে পারে। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চের পর যখন আমি অসহযোগ আন্দোলনে হাজার হাজার জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখলাম এবং সবার মুখে মুখে শুধু স্বাধীনতার কথা শুনতাম তখন বুঝতে পারলাম রুশোর general will কথাটির অর্থ কী। আমি স্পষ্টই দেখতে পেলাম আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে general will সৃষ্টি হয়েছে। সারা দেশের মানুষ এখন ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতার দাবীর ডাকে। এই general will, এই ঐক্যবদ্ধ জনমত গঠিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বহু বৎসরের সাধনা,ত্যাগ এবং কর্মকাণ্ডের ফলে।

আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করি যে আমি নিজের চোখে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসকে এবং বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভূমিকাকে প্রত্যক্ষ করেছি। খুব কম লোকেরই ভাগ্য হয় ইতিহাস সৃষ্টি হতে দেখা। আমি ইতিহাস সৃষ্টি হতে দেখেছি। স্বাধীকার আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে দেখেছি। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার মূল নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অসম্ভব সম্ভব করতে দেখেছি।

আমি আগেই বলেছি সে সময়ের আমাদের অনুভূতি যারা তখন উপস্থিত ছিলেন না, যারা চোখে দেখেননি এবং সেই অনুভূতি যাদের হৃদয়ে তখন স্পর্শ করেনি, তাদেরকে ঠিক ভাষায় বলে বুঝানো কষ্টকর। পৃথিবীর অনেক দেশেই অনেক সময়ে অনেক নেতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। দেশ পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক নেতাই ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তেমনই একজন অনন্য কালজয়ী ইতিহাসের মহানায়ক।

যদিও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর ৪৮ বৎসর এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ৪৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে, তবুও এখন পর্যন্ত সর্বাঙ্গীণভাবে গবেষণালব্ধ বঙ্গবন্ধুর কোন আত্মজীবনী লেখা হয়নি। এই অভাবটা আমাদের জন্য জাতীয়ভাবে একটি লজ্জার বিষয়। আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু জানতে হলে, বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং কর্মকাণ্ডের উৎস খুঁজতে হলে তাঁর নিজের লেখা ডায়েরি যার উপর ভিত্তি করে দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) এবং *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৭) তাই হল সবচেয়ে মূল্যবান সূত্র।*অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* তিনি তাঁর ছোটবেলা, যৌবনের জীবনদর্শন এবং রাজনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* ১৯৫০-এর দশকের পরের ঘটনার বিবরণ নেই, হয়তবা সেই নোটবইগুলি খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু অসমাপ্ত হলেও এই বইটি থেকে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা খুবই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। অন্য বইটি,*কারাগারের রোজনামচাও* তাঁর ডায়েরি ভিত্তিক। ১৯৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৭১ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বৎসর নানা সময় তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। এই বইটিতে ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের সময়ের তাঁর কারাগারের দিনগুলোর বিশদ বিবরণ আছে। এখানেও তাঁর রাজনৈতিক

চিন্তাধারা সুস্পষ্ট। বিশেষ করে স্বৈরাচারী রাষ্ট্র জনগণের আন্দোলনকে দমন করবার জন্য কতরকমের নিপীড়ন করতে পারে, তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এছাড়াও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কত প্রয়োজনীয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বইটির বিভিন্ন স্থানে আমরা পাই।

আমার আজকের এই প্রবন্ধ প্রধানত এই দুইটি বই এবং বঙ্গবন্ধুর অন্যান্য ভাষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছি যাতে যতটা সম্ভব আমরা বঙ্গবন্ধুর নিজের ভাষা শুনতে পাই। আমাদের মনে রাখা দরকার বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ অংশই কেটেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর খুবই অল্প সময়ের জন্য - সাড়ে তিন বৎসর - তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি ব্যয় করেছেন ঔপনিবেশিক ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। প্রথমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এবং তারপর পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি বহুদিন সংগ্রাম করেছেন বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের জন্য।

রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেন কোটি কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। একদিকে তার ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা, অন্যদিকে অতুলনীয় বাগ্মীতা। সাধারণত একই ব্যক্তির মধ্যে আমরা এই দুইগুণের সমাহার দেখিনা। বঙ্গবন্ধু কর্মঠ মানুষ ছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন যে তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে দল সংগঠনের কাজে তার বেশি উৎসাহ ছিল। তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* তিনি লিখেছেন যে যখন তিনি কলকাতায় ছাত্র ছিলেন তখন আবুল হাশিম সাহেব, মওলানা আজাদ সোবহানী, যিনি একজন দার্শনিক ছিলেন, তাকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন ছাত্রদের ক্লাস নেবার জন্য। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

> *আমার সহকর্মীরা অধিক রাত পর্যন্ত তাঁর আলোচনা শুনতেন। আমার পক্ষে ধৈর্য ধরে বসে থাকা কষ্টকর। কিছু সময় যোগদান করেই ভাগতাম। আমি আমার বন্ধুদের বলতাম, "তোমরা পণ্ডিত হও, আমার অনেক কাজ। আগে পাকিস্তান আনতে দাও, তারপর বসে বসে আলোচনা করা যাবে।" ... কাজতো থাকতই ছাত্রদের সাথে, দল তো ঠিক রাখতে হবে।*[১]

তবে তাত্ত্বিক না হলেও বঙ্গবন্ধুর সুনির্দিষ্ট কিছু আদর্শ ছিল, মূল্যবোধ ছিল, লক্ষ্য ছিল এবং সেই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য তিনি একনিষ্ঠভাবে এবং নিরলস কাজ করেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই আমরা তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে পারি। মাত্র তিনটি বাক্যেই বঙ্গবন্ধু তার আত্মপরিচিতি ও মূল্যবোধ অত্যন্ত পরিস্কার করেছেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর একটি উদ্ধৃতি রয়েছে যা তিনি ১৯৭১ সালের ৩০শে মে মাসে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন:

> *একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্প্রীতি উৎস ভালোবাসা, অক্ষয়*

> *ভালবাসা যে ভালবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।*[২]

এই উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে বঙ্গবন্ধু নিজেকে একাধারে মানুষ এবং তার সঙ্গে বাঙালি হিসেবে আত্মপরিচয় স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তাঁর কর্মপ্রেরণার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করছেন বাঙালি এবং মানব সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর ভালবাসা। এই আত্মপরিচয় থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার চারটি বৈশিষ্ট্য: বাঙালি জাতিস্বত্তা, জনসম্প্রীতি, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সমাজতন্ত্র।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার অবশ্যই আরও অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু আজকের এই প্রবন্ধের আলোচনা আমি এই চারটি বৈশিষ্ট্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

বাঙালি জাতিস্বত্তা : স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মুক্তি

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুর বাঙালি আত্মপরিচয়, স্বকীয়তা এবং তা নিয়ে গর্ববোধের পরিচয় পাই। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, কিন্তু আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন সে সময় জনসভায় পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি উত্থাপিত করতেন লাহোর প্রস্তাবের ধারণায়, দুইটি মুসলমান প্রধান সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে:

> *পাকিস্তান দুইটা হবে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; আর একটা পশ্চিম পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে - পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে।*[৩]

বাঙালি জাতিস্বত্তা সম্পর্কে সচেতনতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল দরিদ্র, নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এই ভেবে যে এই নতুন রাষ্ট্রে দরিদ্র মুসলমান কৃষক জমিদার শ্রেনীর নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে। তিনি সব সময় স্বাধীনতার আন্দোলনকে শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন হবার সংগ্রাম হিসাবে দেখেননি, তিনি এটাকে দেখছেন নির্যাতিত দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম হিসাবে। তাঁর জাতীয়তাবাদের ধ্যান ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সুষম সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা। বাঙালির জাতিস্বত্তার স্বীকৃতির আন্দোলনকে তিনি সবসময়ে দেখেছেন একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে, শোষিত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির আন্দোলন হিসাবে। তাই ৭ই মার্চ ১৯৭১-এ তিনি একইসঙ্গে ডাক দেন স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামের জন্য।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে কলকাতায় ছাত্র থাকাকালীন সময়ে যখন তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন তখন বঙ্গবন্ধু ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের দলে যারা প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছিলেন। আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখছেন:

শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মুসলীম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই। মুসলীম লীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। জমিদার, জোতদার ও খান বাহাদুর নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল।[৪]

মুসলিম লীগের এই পূর্ণগঠনের কাজে বঙ্গবন্ধু নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন:

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান পূর্বে ছিল খান সাহেব, খান বাহাদুর ও ব্রিটিশ খেতাবধারীদের হাতে, আর এদের সাথে ছিল জমিদার, জোতদার শ্রেণীর লোকেরা। এদের দ্বারা কোনোদিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হত না। শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব যদি বাংলার যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় না করতে পারতেন এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে টেনে আনতে না পারতেন, তা হলে কোনদিনও পাকিস্তান আন্দোলন বাংলার কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারতনা। [৫]

লাহোর প্রস্তাব যখন ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগ কনভেনশনে পরিবর্তন করা হল এবং দুইটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের বদলে শুধু একটি রাষ্ট্রের কথা প্রস্তাবিত হল সেই পরিবর্তন সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীতে লিখছেন যে তখন তাদের বলা হয়েছিল যে কাউন্সিলের প্রস্তাব পরিবর্তন করা হয় নাই, এটা কনভেনশনের প্রস্তাব। এরপর ১৯৪৭ সালে সোহরাওয়ার্দী এবং শরৎবসুর উদ্যোগে বাংলাকে ভাগ না করে যুক্ত বাংলার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন সেই উদ্যোগের সঙ্গেও বঙ্গবন্ধু যুক্ত ছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে প্রগতিশীল সংগঠন ও বাঙালির বিভিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি কারাবরণ করেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন:

যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনো কালে সহ্য করে নাই। [৬]

তবে সে সময় তিনি যে শুধু ভাষার অধিকার নিয়েই সংগ্রাম করেছেন তা নয়, গরীব এবং নির্যাতিত মানুষের পাশে থেকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলনে যোগ দেন, যেমন কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে, জিন্নাহ ফান্ডের বিরুদ্ধে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতন ভোগী কর্মচারীদের সমর্থনে।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে ছাত্রসমর্থন সংগঠনের অপরাধে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। এরপর ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন যদিও তিনি তখন কারাগারে ছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে যে যুক্তি তার আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন তা

হল:

> *আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নেই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণ বিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে ... বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে এক নায়কত্ব চলবে।*[৭]

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৪৯-৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত হন। বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য বারে বারে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী জোটের একজন সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম দফা ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন এবং বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া। এই নির্বাচনে মুসলীম লীগ দারুণভাবে পরাজিত হয়। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু ৯০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে।

১৯৫৫ সালের মে মাসে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। গণপরিষদের এক বক্তৃতায় তিনি বলেন:

> *ওরা পূর্ববাংলা নামের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। ... বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কেই বা কি ভাবছেন? ... আমার ঐ অংশের [পশ্চিম পাকিস্তান] বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব যে আমাদের জনগণের রেফারেন্ডাম অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেওয়া রায়কে মেনে নেন।*[৮]

অবশ্য বাংলার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি রক্ষার পাশাপাশি তাঁর বৃহত্তর সংগ্রাম ছিল বাঙালি জাতিকে বিভিন্ন শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন:

> *পূর্ব বাংলার সম্পদ কেড়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে কত তাড়াতাড়ি গড়া যায় একদল পশ্চিমা নেতা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারীরা গোপনে সে কাজ করে চলেছিল। ... শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ যে আশা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন, যে পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে কোনো নজর দেওয়াই তারা দরকার মনে করল না।*[৯]

১৯৫৫ সালে কাউন্সিল সেশনে আওয়ামী লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি অপসারণ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু আবারও দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক সরকারের অভ্যুত্থান হয়। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের (১৯৫৮-৬৮) বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধু এই সময় বহুবার কারাবরণ করেন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবী উত্থাপন করেন যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা ন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হয়। সেই বৎসর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষে সারা বাংলায় গণ সংযোগ সফর শুরু করেন। ১৯৬৬ সালের পর থেকে বঙ্গবন্ধু বাঙালী জাতীয়তাবাদের এজেন্ডাকে একমাত্র দাবী হিসেবে উপস্থাপন করেন। ৬ দফা আন্দোলন শুরু করার পর বঙ্গবন্ধু পুনরায় কারাবরণ করেন এবং কারাগারে থাকা অবস্থায় পাকিস্তান সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা)।

ছয়দফা দাবী ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বঙ্গবন্ধুর খ্যাতিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ১৯৬৯ সালে প্রচন্ড ছাত্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকারের পতন হয় এবং বঙ্গবন্ধু কারা মুক্ত হন। কারামুক্তির পর ছাত্র সমাজ তাঁকে "*বঙ্গবন্ধু*" উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারনায় বঙ্গবন্ধু "*বাংলাদেশ*" ও "*জয় বাংলা*" এই দুইটি শ্লোগান ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ - মাত্র চার বৎসরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার পক্ষে ঐক্যমতে আনতে পারেন। এত অল্পসময়ের মধ্যে পৃথিবীতে অন্য কোনো স্থানে জনগণকে এমন সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

বঙ্গবন্ধু সারাজীবন আন্দোলনের রাজনীতি করেছেন ও দল গঠন করেছেন, মুক্তির কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি সবসময়ই গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং গণতন্ত্রের চর্চা করতেন। তিনি লাখ লাখ জনতাকে সংঘবদ্ধ করতেন আন্দোলনে, কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, যাতে গণতান্ত্রিক পন্থার মধ্য দিয়ে জনমত সৃষ্টি করে অধিকার আদায় করা যায় এবং অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা যায়।

ছয় দফা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানী সরকার যখন আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্বিচারে জেলজুলুমের সম্মুখীন করে এবং গণমাধ্যমে খবর প্রচারের বিরুদ্ধে নির্দেশনা দেয় তখন গণতন্ত্রের ভবিষ্যত নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন *কারাগারের রোজনামচায়*। তিনি লিখছেন:

> *খবরের কাগজ এসে গেল। দেখে আমি শিহরিয়া উঠলাম, এদেশ থেকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ চিরদিনের জন্য এরা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে। জাতীয় পরিষদে 'সরকারী গোপন তথ্য আইন সংশোধনী বিল' আনা হয়েছে। কেউ সমালোচনামূলক যে কোনো কথা বলুন না কেন মামলা দায়ের হবে। ... বক্তৃতা করার জন্য ১২৪ ধারা ৭(৩) ... এবং ডিপি আর রুল দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মোটমাট পাঁচটি মামলা আর অন্যান্য আরও তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ... আমার ভয় হচ্ছে এরা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির দিকে নিয়ে যেতেছে। আমরা এ পথে বিশ্বাস*

করিনা। ... আমরা যারা গণতন্ত্রের পথে দেশের মঙ্গল করতে চাই, আমাদের পথ বন্ধ হতে চলেছে।[১০]

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০, এই ২৩ বৎসরে তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমাগত বেগবান হয়েছে, কিন্তু তিনি সবসময়ই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিলেন। যখনই পাকিস্তানী শাসকবর্গ নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছে, তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেছেন, যদিও বারে বারে শাসকশ্রেণী নির্বাচনের ফলাফলকে বানচাল করার চেষ্টা করেছে।

তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও মুক্তির আন্দোলন হিসাবে জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। ... নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামীলীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।

... কি পেলাম আমরা? ... আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।"[১১]

জনসম্প্রীতি : জনগণের রাজনীতি

অনেক সময়ই যারা বড়মাপের নেতা হন তাঁরা জনগণের সঙ্গে তেমন সম্পৃক্ত হন না। তাঁরা জনগণকে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালনার কথা বলেন। তাঁরা অনেক সময়েই থেকে যান জনগণের উর্ধ্বে। বঙ্গবন্ধু এর ব্যতিক্রম। তিনি সমসময়েই বাংলাদেশের জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতেন এবং তাই তিনি বারে বারে একদিকে তাঁর জনগণের জন্য ভালবাসা এবং অন্যদিকে জনগণের তাঁর জন্য ভালবাসার কথা উল্লেখ করতেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন নেতাদের ভাষণ আমি যখন পড়ি এবং তাদের ভাষণের সঙ্গে যখন আমি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তুলনা করি তখন আমার কাছে তাঁর একটি অভিব্যক্তি, "*জনগণের প্রতি ভালবাসা*", তা অনন্য বলে মনে হয়েছে। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জন্য তাঁর যে ভালোবাসা এবং প্রতিদানে জনগণের যে ভালবাসা তিনি পেয়েছেন তার কথা তিনি নানা ভাষণে বার বার ব্যক্ত করেছেন।

এই ভালবাসাই সৃষ্টি করেছিল জনগণের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর টান। তিনি জানতেন জনগণ তাঁর উপর অসীম আস্থা রাখে এবং তিনিও সবসময় সজাগ থাকতেন যেন তাঁর কোনো কর্মকাণ্ডে এই আস্থার স্থানটি ক্ষুণ্ন না হয়।

১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে আসার পর এক জনসভায় তিনি বলেন:

> *বাংলার মানুষকে আমি জানি। আমাকেও বাংলার মানুষ চেনে। বাংলার মানুষকে আমি ভালবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালবাসে। আমি তাদের জন্য কোনো কাজে হাত দিয়ে কখনো হাল ছাড়ি না।*[১২]

তাঁর এই দৃঢ়তা, জনগণের কাছে তিনি একটি প্রতিজ্ঞাকরলে কিংবা জনগণের পক্ষ হয়ে একটি কাজ হাতে নিলে, তিনি যে কখনই সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গবেন না, কিংবা সেই কাজ থেকে পিছ পা হবেন না, এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের একটি অসামান্য গুণ।

বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজতন্ত্র এই সব নানা রকমের আদর্শে বিশ্বাস করতেন, তবে সাধারণ মানুষের দুঃখে, কষ্টে তাদের পাশে দাঁড়ানো, জনসাধারণ কোন কোন ইস্যুকে প্রাধান্য দিচ্ছে তার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। জনসাধারণের ইস্যু নিয়েই তিনি কথা বলতেন, রাজনীতি করতেন। আমরা দেখতে পাই যখন তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তখন তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলে কাজ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন দেশে খাদ্যের অভাব তখন তিনি সুষম খাদ্য বন্টনের আন্দোলন, ভুখা মানুষের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে কাজ করেন। দাঙ্গা কবলিত মানুষকে উদ্ধারের জন্য কাজ করেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক ছিলনা, সাধারণ মানুষের সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তিনি তার রাজনৈতিক চিন্তা গড়ে তুলেছিলেন।

তাঁর লেখায় আমরা দেখতে পাই দেশে বন্যা কিংবা খাদ্যাভাব অথবা দ্রব্যমূল্য বা কর বৃদ্ধি হলে তাঁর কত দুশ্চিন্তা হত। জনসাধারণের উপর যে সব ইস্যু প্রভাব ফেলে তার সবই তার রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্যে ছিল। যেমন *কারাগারের রোজনামচায়* তিনি লিখছেন:

> *খবরের কাগজ এসেছে ... সিলেটের বন্যায় দেড়লক্ষ লোক গৃহহীন, ১০ জন মারা গেছে। কত যে গবাদি পশু ভাসাইয়া নিয়া গেছে তার কি কোনো সীমা আছে। কি করে এদেশের লোক বাঁচবে তা ভাবতেও পারিনা। ... কত কর মানুষ দিবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শোয়েব সাহেব বলেছেন জনসাধারণ অধিকতর সচ্ছল হইয়াছে তাই কর ধার্য্য করেছেন। তিনি যাদের মুখপাত্র এবং যাদের স্বার্থে কাজ করেছেন তারা সচ্ছল হয়েছে। তাদের করের বোঝা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিল্পপতি ও বড় ব্যবসায়ীরা আনন্দিতই শুধু হন নাই, প্রকাশ্যে মন্ত্রীকে মোবারকবাদ দিয়ে চলেছেন। আর জনগণ এই গণবিরোধী বাজেট যে গরীব মারার বাজেট বলে চিৎকার করতে শুরু করেছে।*[১৩]

যারা সমাজে অনাদৃত ও বঞ্চিত তাদের প্রতি তার বিশেষ সহমর্মিতা ছিল। *কারাগারের রোজনামচা* বইটিতে তিনি বিভিন্ন কয়েদিদের জীবন বৃত্তান্ত, দুঃখ, কষ্ট বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে পাগল কয়েদিদের প্রতি তাঁর মমতাবোধ আমরা লক্ষ

করি। এই বইটিতে তিনি লিখছেন:

> *আমি মাঝে মাঝে বিড়ি কিনে পাগলদের দিতাম, বড় খুশি হত বিড়ি পেলে।*[১৪]

জেলের কর্মচারীদের সঙ্গেও তাঁর সম্প্রীতি গড়ে উঠে। তিনি জেলে নিজ হাতে রান্না করেছেন, বাগান করেছেন এবং তার সঙ্গে ডায়েরিও লিখেছেন। আওয়ামী লীগের অগণিত কর্মীদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখেরও তিনি খবর রাখতেন। তাঁর দুটি বইটিতেই আমরা তাঁর বহু সহকর্মীদের এবং আওয়ামী লীগের নাম জানা-অজানা বহু কর্মীদের ত্যাগ তিতীক্ষার বর্ণনা পাই।

বঙ্গবন্ধু একদিকে ছিলেন সাধারণ মানুষের লোক, মানুষের কাছ থেকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি জেনেছেন, শিখেছেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন জনতার নেতা। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি সামনের দিকে, প্রগতির দিকে নিতে চেয়েছেন। সববিষয়ে তিনি শেষ ভরসা করতেন মানুষের উপরে। তাই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে তার ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি জনগণকে আহ্বান করেন, বলেন "*যার যা আছে তাই নিয়ে*" স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হবার জন্য। জাগ্রত জনতার উপর তার বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি সেদিন বলতে পেরেছিলেন

> "*সাতকোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবানা। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবানা। ... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ*"।[১৫]

অসাম্প্রদায়িকতা : সকল নাগরিকের সমঅধিকার

যদিও বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সুসংহত করেছিলেন কিন্তু তিনি কখনও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি ও সংঘাতের রাজনীতি করেননি। বহু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এক জাতিকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে সহিংস আচরণের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শোষকদের হাত হতে বাঙালির মুক্তি কামনার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। বাঙালিকে অন্য কোনো জাতির বিরুদ্ধে সহিংস আচরণে প্ররোচনা দেননি। সম্প্রতি আমরা পশ্চিমের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান দেখছি যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তিক্ততা এবং সংখ্যাগুরুদের সংখ্যালঘুদের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব লক্ষ করছি। বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদের চিন্তা ছিল এর বিপরীত। তিনি সব গোষ্ঠীর সহাবস্থান এবং সব নাগরিকের সমান অধিকারে বিশ্বাস করতেন। তাঁর *আত্মজীবনীতে* তিনি নিজেকে একাধারে বাঙালি এবং মানুষ হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কোনো অমানবিক কাজের সমর্থন কখনো করেননি। তিনি সমসময়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই আমরা দেখি তাকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে। ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পাকিস্তান সৃষ্টি

নিয়ে নানা বিতর্কের উদ্ভব হয় তখনকার দিনের তাঁর অবস্থান সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনীতে লেখেন যে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতে মুসলমানরা এবং পাকিস্তানে হিন্দুরা নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ করবে। তিনি লিখেছেন:

> *পাকিস্তানে মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে। ভারতবর্ষে হিন্দুরাও মুসমলমানকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে।*[১৬]

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। সোহরাওয়ার্দী তাঁদেরকে এই দিবসটি শান্তিপূর্ণভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সোহরাওয়ার্দী সরকারকে কেউই দোষারোপ করতে না পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতায় এবং পরে নোয়াখালীতে। কলকাতায় তিনি হিন্দু, মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোককেই দাঙ্গা দেখে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এরপর যখন মহাত্মাগান্ধীর সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্যে সোহরাওয়ার্দী যুক্ত হয়েছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমন করেছেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বঙ্গন্ধু যখন কলকাতা থেকে চলে আসেন তখন সোহরাওয়ার্দী তাকে বলেন তিনি যেন পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কাজ করেন যাতে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিম বঙ্গে চলে আসতে বাধ্য না হয়। সোহরাওয়ার্দী তাকে বলেছিলেন:

> *চেষ্টা কর যাতে হিন্দুরা চলে না আসে। ওরা এদিকে এলেই গোলমাল করবে, তাতে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে পূর্ব বাংলায় ছুটবে। যদি পশ্চিম বাংলা, বিহার ও আসামের মুসলমান একবার পূর্ব বাংলার দিকে রওয়ানা হয় তবে ... এত লোকের জায়গাটা তোমরা কোথায় দিবা...।*[১৭]

ঢাকায় ফিরে এসে গণতান্ত্রিক যুবলীগে যোগ দিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক মিলনকে একমাত্র কর্মসূচি হিসাবে নেবার উপর জোর দেন। *পূর্ব বাংলায় যাতে দাঙ্গা না হয় তার জন্য তিনি সব সময়ই সতর্ক ছিলেন।* দাঙ্গা বলতে যে শুধু হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা তাই নয়, সবরকমের দাঙ্গারই তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে লাহোরে ১৯৫৩ সালের কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার তিনি নিন্দা করেছেন। ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন তিনি। *১৯৫৪ সালে নারায়নগঞ্জের আদমজি পাটকলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা যাতে বিস্তৃতি লাভ না করে তার জন্য তিনি কাজ করেন। ১৯৬৪ সালে ভারতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর তিনি সারা বাংলাদেশে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন এবং "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" শিরোনামে বহু প্রচার-পত্র প্রকাশ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণেও তিনি জনগণকে সতর্ক করে বলেন:*

> *মনে রাখবেন শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছেন তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের ওপরে - আমাদের যেন বদনাম না হয়।*[১৮]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন আওয়ামী লীগ প্রথমে আওয়ামী মুসলিমলীগ নামে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি লিখছেন যে সে সময়ের বিবেচনায় এই মুসলিম শব্দটি রাখতে হয়েছিল কারণ ইতিমধ্যেই যারা মুসলীমলীগের বিরোধীতা করছিল তাদের "পাকিস্তানের শত্রু" বা "ভারতের চর" হিসাবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল,যদিও অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি প্রথম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেবার পক্ষে ছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় হলেও তার পর পরই *আওয়ামী লীগ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বদলে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী করে। আমরা এর আগেই দেখেছি ১৯৫৫ সালে গণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু যৌথ নির্বাচন দাবী করেন।*

ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্গবন্ধু নামাজ পড়তেন, রোযা রাখতেন, কোরআন শরীফ পড়তেন, এবং সকল নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন।

সমাজতন্ত্র : শোষণ মুক্তি ও বৈষম্যহীনতা

তাঁর আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখছেন:

> *আমি নিজে কমিউনিষ্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করিনা। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।*[১৯]

তাঁর দুটি বই এবং বিভিন্ন ভাষণে প্রায়ই বঙ্গবন্ধু জনগণকে শোষণ মুক্ত করে এক বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সমাজতন্ত্র বলতে তিনি প্রধানত শোষণ মুক্ত এবং বৈষম্যহীন একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতেন। ১৯৫২ সালে চীন যাবার পর চীন এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে পার্থক্য তিনি দেখেছেন তা তার মনে গভীর দাগ কেটেছে। এই দুই দেশের পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি লিখছেন:

> *তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল তাদের জনগণ জানতে পারল ও অনুভব করতে পারল এই দেশ ও এদেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগণ বুঝতে আরম্ভ করল, জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউই নন।*[২০]

শোষণ মুক্তি এবং বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের যে দায়িত্ব আছে তা তিনি বিশ্বাস করতেন। চীনে গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন চীন সরকার জনসাধারণের জন্য কি কি কাজ করছে, সে দেশে প্রাধান্য পাচ্ছে শিল্প কারখানার উন্নতি, শৌখিন দ্রব্য নয়।

তিনি লিখছেন:

> *ভুমিহীন কৃষক জমির মালিক হয়েছে। আজ চীন দেশ কৃষক মজুরের দেশ।*

শোষক শ্রেণী শেষ হয়ে গেছে।[২১]

নতুন নতুন স্কুল, কলেজ গড়ে উঠেছে চারিদিকে। ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার সরকার নিয়েছে।[২২]

*কারাগারের রোজনামচায়*ও তিনি লিখেছেন বৈষম্যহীনতার কথা।তিনি লিখেছেন যে কারাগারে তিনি সবার সঙ্গে একসাথে খেতেন যেমন ব্যবস্থা ছিল তাঁর নিজ বাড়িতে:

আমি যাহা খাই ওদের না দিয়ে খাই না। আমার বাড়িতেও একই নিয়ম। ... আজ নতুন নতুন শিল্পপতিদের ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও দুই পাক হয়। সাহেবদের জন্য আলাদা, চাকরদের জন্য আলাদা। আমাদের দেশে যখন একচেটিয়া সামন্তবাদ ছিল, তখন জমিদার, তালুকদারদের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা ছিলনা। আজ সামন্ততন্ত্রের কবরের উপর শিল্প ও বাণিজ্য সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে, তখনই এই রকম মানসিক পরিবর্তনও শুরু হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের শোষণের চেয়েও এই শোষণ ভয়াবহ।[২৩]

স্বাধীনতার পর তার স্বপ্নের সোনার বাংলায় তিনি কোনো বৈষম্য দেখতে চাননি। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন:

বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না। সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে এবং উচ্চতর আয় ও নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বি বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করতে হবে।

উপসংহার : বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ও সংবিধানের চার মূলনীতি

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারার যেই চারটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমি আলোচনা করেছি তার প্রতিফলন আমরা আমাদের সংবিধানের চার মূলনীতিতে দেখতে পাই। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের এক অধিবেশনে তিনি আমাদের সংবিধানের চার মূলনীতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন:

জাতীয়তাবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চলবে বাংলাদেশে। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষকশ্রেণী আর কোনোদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে না, মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে না, বাংলার মানুষ এটা চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না।[২২]

তাঁর কর্মকাণ্ডের লক্ষ তিনি খুব সহজ দুটি শব্দে প্রায়ই ব্যক্ত করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন তাঁর লক্ষ হচ্ছে "*সোনার বাংলা গড়ে তোলা*", কিংবা তিনি বলতেন "*দুঃখি মানুষের মুখে তিনি হাসি ফোটাতে চান*"। বঙ্গবন্ধু তাঁর জনসভায় খুবই সহজ সরল ভাষায় বক্তৃতা করতেন। তাই তার বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭২ সালে এক জনসভায় তিনি বলেন:

> *আমি কি চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কি চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।*

তাঁর বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, কিংবা অন্য তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি ঠিকই জানতেন জীবনে একটি হাসি কত অমূল্য এবং সেই অমূল্য সম্পদই অর্জন করাটা ছিল তাঁর লক্ষ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২, পৃ ৪১
২. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ i
৩. *আত্মজীবনী*, পৃ ২২
৪. *আত্মজীবনী*, পৃ ১৭
৫. *আত্মজীবনী*, পৃ ৩৫
৬. *আত্মজীবনী*, পৃ ৯০
৭. *আত্মজীবনী*, পৃ ১২০
৮. *আত্মজীবনী*, পৃ ২৯৪
৯. *আত্মজীবনী*, পৃ ২৪০-২৪১
১০. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৭, পৃ ৬১-৬২
১১. https://bn.wikipedia.org/wiki/সাতই-মার্চের-ভাষণ
১২. সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ৭ জুন, ১৯৭২
১৩. *কারাগারের রোজনামচা*। পৃ ৮৭
১৪. *কারাগারের রোজনামচা*। পৃ ৩৫
১৫. https://bn.wikipedia.org/wiki/সাতই-মার্চের-ভাষণ
১৬. *আত্মজীবনী*, প ৩৬
১৭. *আত্মজীবনী*, প ৮২
১৮. https://bn.wikipedia.org/wiki/সাতই-মার্চের-ভাষণ
১৯. *আত্মজীবনী*, পৃ ২৩৪
২০. *আত্মজীবনী*, পৃ ২৩৪
২১. *আত্মজীবনী*, পৃ ২৩০
২২. *আত্মজীবনী*, পৃ ২৩৩
২৩. *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ ১৮৯

অধ্যাপক রওনক জাহান বর্তমানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর একজন সম্মাননীয় ফেলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং স্কলার। ১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স-এ অতিথি অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি জ্যেষ্ঠ গবেষক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮২-৮৪ সালে ইউএন এশিয়া-প্যাসিফিক ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া এবং ১৯৮৫-১৯৮৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড-এর উইমেন্স প্রোগ্রামের প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় হার্ভার্ড, শিকাগো, ও বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় এবং নরওয়ে-এর ক্রিস মিশেলসেন ইন্সটিটিউট-এ রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন। অধ্যাপক রওনক জাহান যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান-এ পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

অধ্যাপক রওনক জাহান আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে: ১৯৭২ সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন*; ১৯৭৯ সালে ইন্সটিটিইট অব ল' অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স থেকে প্রকাশিত *উইমেন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট: পারসপেক-টিভস্ ফ্রম সাউথ অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া* (সহ-সম্পাদক); ১৯৮০ এবং ২০০৫ সালে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশ পলিটিক্স: প্রবলেমস অ্যান্ড ইস্যুজ*; জেড বুকস, লন্ডন থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *দি ইলিউসিভ এজেন্ডা: মেইনস্ট্রিমিং উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট*; একই প্রকাশনা সংস্থা থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত *বাংলাদেশ: প্রমিজ অ্যান্ড পারফরম্যান্স* (সম্পাদিত); এবং ২০১৫ সালে প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত *পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন বাংলাদেশ : চ্যালেঞ্জেস অব ডেমোক্রেটাইজেশান*।

অধ্যাপক রওনক জাহান বাংলাদেশের উইমেন ফর উইমেন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস্ (রিব), বাংলাদেশ-এর বোর্ড সদস্য। তিনি হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ, এশিয়া, নিউ ইয়র্ক এবং কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় এর সাউথ এশিয়া প্রোগ্রাম-এর উপদেষ্টামন্ডলীর একজন।

২০০৮ সালে অধ্যাপক রওনক জাহানকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে র‍্যাডক্লিফ ইন্সটিটিউট গ্রাজুয়েট সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

প্রফেসর ড. এস এম হাসান জাকিরুল ইসলাম, পরিচালক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত